International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

বাংলা কথাসাহিত্যে নারী ব্যক্তিত্বের ক্রমজাগরণ

সওকত আলি সা, গবেষক,
ডক্টর তনুশ্রী ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, সি. এম. জে. বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পর একে একে আসে বাংলা নাটক ও উপন্যাস। মূলত পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাট্যধারার অনুসরণ করে বাংলা নাটকের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তাতে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলির একটা বড়ো প্রভাব পড়েছিল। উপন্যাসেরও একটি প্রধান গুণ বাস্তবতা। সমাজ ও পরিপার্শ্বকে বাদ দিয়ে তা রচিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রভাব বাংলা উপন্যাসেও দেখা গিয়েছিল। প্রথম সার্থক বাংলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই বলা হয়। তার হাতে বাংলা উপন্যাস প্রথম শিল্প সার্থকতায় সিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র উনিশ শতকে তাই বাংলা উপন্যাসের প্রতিনিধিত্ব করছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ সম্পর্কে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'চরিতকথা' গ্রন্থের অন্তর্গত ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন - 'বঙ্কিমবাবুর পূর্বেও অনেকে বাংলা নবেল লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর একদিনেই বাঙলায় সাহিত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হইল।” , বঙ্কিম সমসাময়িককালে আরও অনেক লেখক ই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাদের অধিকাংশই হয়েতো বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে উনিশ শতকের অন্যান্য গৌণ ঔপনাসিকদের রচনা বঙ্কিমের মতো সমুন্নতি লাভ করেনি। এই বঙ্কিম সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের কিছু কিছু উপন্যাসে সরাসরি উনিশ শতকীয় নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলির প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কোথাও কোথাও লেখক স্বয়ং এই উদ্দেশ্যমূলকতা স্বীকার করেছেন উপন্যাসের সূচনায়। এই ধরনের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব চিহ্নিত বাংলা উপন্যাসে নারীকে কেন্দ্র করেই উদ্দেশমূলক বক্তবা প্রকাশিত হয়েছে।

মুল বিষয়বস্তু:

বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শৈশব সহচরী' (১৮৭৮) উপন্যাসে বিধবার প্রণয়, অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিবাহ ও তার স্বাভাবিকতাকে সরাসরি স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিধবা কুমুদিনীর জীবন আবার দাম্পত্য জীবনের সার্থকতার গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিধবা বিবাহ বিষয়টির প্রতি সাধারণের সহানুভূতি উদ্রেকের প্রচেষ্টাও উপন্যাসে বর্তমান। লেখক বিধবা বিবাহের বর্ণবিরল সভাচিত্র অঙ্কনে সমাজের তৎকালীন অবস্থা ও জনমানসের সার্থক চিত্র প্রকাশ করেছেন "বিধবার বিবাহ, বড় সমারোহে নাই। বালিকা কন্যা নহে বালক বর নহে- সুতরাং বাজনাবাদ্য, রোশনা রোশনাই, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রের হুড়োহুড়ি নাই, লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই, উদযোগের বড় বাড়াবাড়ি নাই। - বিশেষ বিধবার বিবাহ হিন্দুয়ানী ছাড়া কাজ, যে বরযাত্রা বা কন্যাযাত্র আসিবে তাহারই জাতি যাইবে, লোকজনের বড় শব্দ নাই। সব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া – চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটি ঘরে একটি বিছানা হইল। লুকাইয়া মালী একটা টোপর দিয়া গেল, লুকাইয়া নাপিত ও পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী আচারে শাশুড়ীর মন উঠে না। অন্তত সাতটি এয়ো চাই নহিলে বরণ হয় না। বিধবার বিবাহ কেই বা আসে। কেহ আসিতে চায় না, হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন সাতটি এয়ো জুটে নাই। তাঁহার মনটা চটিয়া জুলিয়া পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন, পাড়ার মাগীদের ন্যাকরা দেখে আর বাঁচি না। যা তো বিনোদিনী মাগীদের ডেকে আগেত। মাগীরা সেদিন কায়েতের ছেলের ভাতে লুচি মন্ডা মেরে এলো আর আমার মেয়ের বিয়েতে আসতে পারে না। ..... না আসে ত যা হবার তা হবে।" (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ)

এখানে বিবাহের চিরাচরিত প্রথা অনুসরণে হরিনাথের স্ত্রীর আন্তরিক আগ্রহ ও বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক দলাদলির ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বিধবা নারী এখানে স্বাধিকার চেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধে উজ্জীবিত কুমুদিনী বিধরা, তার পিতা হরিনাথ মুখার্জী গৃহত্যাগী। কিন্তু বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্য তিনি সংসারে ফিরে এসেছেন।

কুমুদিনীর যখন প্রথম বিবাহ হয়েছিল, তখন সে বিবাহের প্রকৃত অর্থ জানত না। কিন্তু এখন সে বিবাহের অর্থ বুঝেছে। তাই তার সুখের সীমা নেই। কুমুদিনীকে বিবাহ করবার জন্য দুই যুবক প্রস্তুত। একজন শরৎকুমার, অবিবাহিত অপর রজনীকুমার, সে বিপত্নীক। কুমুদিনীর কাছে বড় সমস্যা হল পাত্র নির্বাচন। রজনী ও শরং এর পার্থক্য সে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পেরেছে -

"শরতের স্নেহের সহিত রজনীর স্নেহের কত প্রভেদ। ..... রজনী তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে ও ভালোবাসে, শরৎকুমার পুজলীর ন্যায় ভালোবাসে। যতদিন তাহার রূপ থাকিবে, ততদিন

তাহার ভালোবাসা ।" স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কুমুদিনীর এই ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সমাজে নিঃসন্দেহে এক অনন্যসাধারণ বিষয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই উপন্যাসে বিধবা নারীকে বিবাহের মধ্যে বা তার ভালাবাসাকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে পুরুষের কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তাড়না ছিল না, যা দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের বিধবা নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব ছিল না। কিন্তু শৈশব সহচরী' তে রজনী নারীজের পূর্ণ মর্যাদা। ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিধবা কুমুদিনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছে। শুধুমাত্র ভোগ্য সামগ্রী- হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে চায় নি।

নারীত্বের এই মর্যাদা দেখা যায় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'বিমলা' (১৮৭৭) উপন্যাসেও। এখানে বিমলা ও যোগেশের স্বাধিকার দীপ্ত রোমান্টিক প্রেমকথার পাশাপাশি এক বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। বিধবা মনোরমাকে বিবাহ করেছে নরেন্দ্র। এর জন্য সমাজে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাননি লেখক। নরেন্দ্র র মধ্যেও নেই কোন বিধা দ্বন্দ্ব বা সংকোচ। এখানেও অসহায় বিধবা নারী পুরুষের কামনার উৎস হয় নি, বরং জীবনে জীবন যোগ করার নিশ্চিত অবলম্বন হয়েছে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক সমাজের এইরকম ইতিবাচক মনোভাবকেই স্বাগত জানিয়েছেন তা বোঝা যায়।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি উপন্যাস 'দুই ভগ্নী' (১৮৮১) । এখানেও বাল্যবিবাহ ও কৌলীনা প্রথার ফলস্বরূপ আগত অকালবেধব্য কি ভাবে নারীর জীবনকে ও পারিপার্শ্বিককে বিড়ম্বিত করে তোলে তা দেখিয়েছেন। লেখক। এই উপন্যাসে বিনোদিনী ও যোগেনের দাম্পত্য জীবনে এক জটিল আৰত সৃষ্টি করেছে বিনোদিনীর ভগ্নী বিধবা অষ্টাদশী কমলিনীর অনুপ্রবেশের চেষ্টা। জীবনবাসনায় ও প্রকৃতির তার্ডনায় কমলিনী নিজ জমীর সংসারে আগুন লাগাতে উদ্যত হয়েছে। তার কাছে সমাজজ্ঞান, অনুশাসন, ভগ্নীপ্রীতি কিছুই গুরুত্ব পায় নি।

মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন একজন প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী মানুষ। তাঁর লেখা তিনটি উপন্যাস, মেজবৌ(১৯৭৯, যুগান্তর(১৮৮৫) ও নয়নতারা (১৮৯২) -তে বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও স্ত্রী শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনগুলির প্রভাবের পরিচয় রয়েছে। 'মেজবৌ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা দুটি প্রসঙ্গই এসেছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে লেখক এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন - "গুরুজনের শুশ্রূষা, পতিসেবা, দাসদাসীদিে প্রতি বাৎসল্য, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যা, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সৌজন্য, এইগুলিই নারীগণের শিক্ষনীয় প্রধান সদগুণ। এইগুলিকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দু একটি মাত্র চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।" উপন্যাসে কুলীন বসু জীবনের বিড়ম্বনা, বঞ্চনা এবং বাল্যবিধবার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা নিখুঁতভাবে চিত্রিত

হয়েছে। এর থেকে স্পষ্টতই শতকব্যাপী নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন গুলির প্রভাব অনুভব করা যায়। উপন্যাসে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে শ্যামা জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়ঃক্রম সতের কি আঠারো বৎসর, কুলীনের ঘরে পড়িয়ছিল, সুতরাং তাহার আর শ্বশুরঘর করিতে যাইতে হয় নাই। সে পিত্রালয়েই বাস করে।

বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'কুলীন বাহিনী' (১২৯২) উপন্যাস। এই উপন্যাসে কৌলীন্য প্রথার কুফল দেখিয়ে এক বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণকে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন। ঔপন্যাসিক ভূমিকায় উপন্যাসটির আন্দোলনভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলকতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে সমাজের যে কলঙ্কময় চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে, তা অতিরঞ্জন নয় এবং নয় বলেই তা প্রকাশের প্রয়োজন। উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায় কৌলীন্য প্রথার কারণে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দরিদ্র বিধবার কন্যা কামিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন কুলীন বর যথারীতি পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে নববধূকে রেখে চলে যায়। দিন কেটে যায়। কামিনীর স্বামী আর শ্বশুরগৃহাভিমুখী হয় না, অবশেষে শাশুড়ীর কাকুতি মিনতিতে দীর্ঘদিন পর তার আগমন ঘটে। কিন্তু উপযুক্ত মর্য্যাদা (অর্থ) না পাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন। কামিনী সখী বিমলার কাছ থেকে পাঁচটাকা ধার করে এনে দিলে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বৃদ্ধ তখন-ই গৃহত্যাগ করে। অনাথা কামিনী অন্যের বাড়িতে পাচিকাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে সে স্বামীকে ডেকে পাঠায় এবং সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তাকে দিয়ে বলে " আমার দুখিনী মা একসময় আপনার হাতে পাঁচটা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, আপনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন,এ টাকা সবই আপনার।" ২৮ এই ঘটনায় সেই কুলীন ব্রাহ্মণ নিজের নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তবে কৌলীন্যের দুর্গতির চিত্র অঙ্কন করলেও লেখক কামিনী চরিত্রে কোন প্রতিবাদের অঙ্কুর রোপন করেন নি। যদিও সখী বিমলা তাকে সিঁদুর পরাতে গেলে তার অন্তরের বঞ্চনা ও বেদনার ক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটেছে। তবু কথা প্রসঙ্গে বিমলা তার স্বামীর নিন্দা করলে কামিনী তার প্রতিবাদ করে স্পষ্টতই জানা যে স্বামীর গুণাগুণ বিচারের অধিকার তার নেই। বিমলাও কামিনীর পতিভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তার দুর্গতির জন্য ঈশ্বরকেই অভিযুক্ত করে।

দীনেশচরণ বসু তার 'নিরাশ প্রণয়' (১২৯৫) উপন্যাসে কৌলীন্য প্রথার মিথ্যা মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়ে সমকালীন সমাজের অনুরূপ ঘটনা অঙ্কন করেছেন তিনি। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরজার প্রণয় সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ কুলীন না হওয়ায় সুরজার পিতা তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন না। ফলে বিবাহের পূর্বদিন সুরজা আত্মহত্যা করে। নগেন্দ্রনাথ সুরজার শোকে তার চিতায় ঝাঁপ দেয়। সুরজার মা অন্নপূর্ণা দেবীও কন্যার শোকে প্রাণ

ত্যাগ করেন। সুরজার পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রায় উন্মত্ত হয়ে কাশীবাসী হন। উদ্দেশ্যমূলক এই উপন্যাসটি সামাজিক সমস্যার কিছু চিত্র তুলে ধরলেও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এর অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি করেছে। এই আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সমকালীন জনমানসে এটি আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এর সাহিত্যমূল্য নামমাত্র।

কেদারেশ্বর সেন তার 'স্মৃতিমন্দির' (১৯০০) উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে তার সপক্ষে জনমত গঠন করতে চেয়েছেন। এর কাহিনীতে দেখা যায় হরিনাথ তার স্ত্রী সর্বাণীকে অবসর সময়ে বাড়িতে লেখাপড়া শেখায়। তার মতে স্ত্রী শিক্ষিত হলে গৃহকাজ, পুত্র-কন্যার লালন পালন, সুশিক্ষার ব্যবস্থা, জমিদারী কাজকর্ম তদারক "ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। ফলে পরিবারের কর্তা নিশ্চিন্তে বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু হরিনাথের মা ও প্রতিবেশীরা সর্বাণীর এই শিক্ষালাভকে সমর্থন করেনি। মায়ের সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূর বিবাদ ও অশান্তি বাড়তেই লাগল। সমস্ত গ্রামে সর্বাণী ও হরিনাথের কুৎসা ও অপদার্থতা প্রচারিত হল, ফলে সর্বাণী গৃহত্যাগ করে। সর্বাণীর অবর্তমানে শাশুড়ী উপলব্ধি করলেন যে শিক্ষিতা বধুর মার্জিত রুচিতে এতদিন সংসার শ্রীসম্পন্ন ছিল।

সত্যচরণ মিত্রের 'অবলাবালা (১৮৮৭) উপন্যাসটিতেও এভাবেই আন্দোলনকে সমর্থন করে বাল্যবিবাহের কুফল এবং বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন দেখানো হয়েছে। অবলাবালার বিবাহ হয় তিন বছর বয়সে, স্বামীকে সে চোখেই দেখে নি, কারণ তার স্বামী যোগেন্দ্র কলকাতায় লেখাপড়া করে। অবলাবালার চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য হল বিবাহের প্রতি তার শ্রদ্ধা, স্বামীর প্রতি অবিচল ভক্তি ও আস্থা, সতীত্ব এবং ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণেই তার আচার আচরণ হয়েছে সমাজ প্রচলিত ছক অনুসারী। দীর্ঘদিন স্বামীর সংবাদ না পেয়েও সে পুনর্বিবাহে রাজী হয়নি। বরং গণনায় বিশ্বাস করে স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এদিকে তার স্বামী যোগেন্দ্র কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হয়ে তার মন হয়েছে আধুনিক এবং সংস্কারমুক্ত। তাই বাল্যের ছেলেখেলার মতো বিবাহকে সে বিবাহ বলে মনে করে না। এ বিষয়ে তার বক্তব্য-

"করে ছেলেবেলায় মা বাপ ধরে বে দিয়েছিল, সে কি আর বিবাহ? এই বিবাহই বিবাহ।"

তাই সে যুবক বয়সে বিধবা সুশীলাকে বিবাহ করেছে। অবলা স্বামীর সন্ধানে বেড়িয়ে তাকে খুঁজে পেয়েছে বটে, কিন্তু স্বামীর অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনায় শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেছে। বাল্যবিবাহের ফলে এখানে অবলার জীবনে যে দুঃখ- দুর্দশা নেমে এসেছে তা এই সামাজিক কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে জনমত গঠন করতে পেরেছিল।

খগেন্দ্রনাথ রায়ের 'শ্রী' (১৮৯৩) উপন্যাসেও বিধবাবিবাহ ও তার সামাজিক সমস্যা বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। বিধবা সীতা আদর্শবান ভবঘুরে যুবক জীবনকে ভালোবাসে। বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য থেকে জেগে ওঠে তার প্রেন পিপাসী নারীসত্ত্বা। শেষপর্যন্ত জীবনের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়েছে। যদিও সমাজের ভয়ে পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র এ বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সমাজপতিদের রুদ্ররোষ এসে পড়েছে শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্পাপ কন্যা শ্রীর উপর। পিতামাতার সমাজবিধি লঙ্ঘনের প্রতিশোধ এভাবে গৃহীত হয়েছে সন্তানের ওপর দিয়ে।

নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলির বিপক্ষে যে সমস্ত উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী ছিল। স্ত্রীশিক্ষার বিপকে। প্রচলিত দেশাচার অনুযায়ী নারীর দুর্দশার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার স্বপক্ষে বহু লেখক লেখনী ধারণ করেছিলেন জনমত গঠন করবার জন্য। তুলনায় বিপক্ষীয়েরা তাদের মত প্রকাশের জন্য গ্রহিতাকে সেভাবে হাতিয়ার করেন নি। একমাত্র স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গল্প 'বীরবালা'। নামকরণেই বোঝা যায় এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বীরবালা নাম্নী এক কিশোরী। লেখক তাকে শান্ত, লজ্জাশীলা, নম্র ও পতিপরায়ণা করে এঁকেছেন। স্বামীকে কারামুক্ত করবার জন্য সে ভূতদের সহায়তায় পৃথিবীর একাধিক দেশ ভ্রমণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে ঘরে ফিরলে আনন্দ উৎসব শুরু হয়েছে পরিবারে। গল্পের শেষে লেখকের উপদেশ " এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।" তবে নারীর এই আদর্শায়িত রূপ অন্ধন ছাড়াও এই গল্পে উল্লেখ রয়েছে রাজপুত জাতির বাল্যবিবাহ ও সদ্যোজাত কন্যা হত্যার প্রসঙ্গ যা তৎকালীন সমাজের এক বাস্তব চিত্র।

লুল্লু ভূতের গল্প। এ গল্পে সরস ব্যঙ্গে কটাক্ষ করা হয়েছে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের প্রতি, সমুদ্র পার হলে হিন্দুর জাতিভ্রষ্ট হওয়ার প্রতি। নারীচরিত্র বলতে আমীরের স্ত্রী যাকে লুঘু ভূত অপহরণ করেছিল, চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী সে অপরূপ রূপবতী এবং সতী সাক্ষী নায়িকা। আমীরের বিরহে সে অশোকবনে বন্দিনী সীতার মতো অমোচন করে। আবার আমীরের সঙ্গে পরিকল্পনা করে লুলুকে ছলনা করে চন্ডুর নেশা ধরায় তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য। তবে গল্পের শেষে আমীর-রমণীর লুন্নুর পিঠে চেপে বাপের বাড়ী যাওয়া বা সমুদ্র দেখতে যাওয়া এবং তাকে সোনার পাখা গড়িয়ে দেওয়া কৌতুকাবহ হলেও কোথাও যেন সূক্ষ্ম বিদ্রূপের খোঁচা থেকে যায়। নয়নচাদের ব্যবসা গল্পে নারী চরিত্রের পরিচয় তেমনভাবে নেই, তবে 'নেই আঁকুড়ে' দাদার বিধবা ভগিনীর প্রসঙ্গ আছে। যে সারাজীবন নিয়মনিষ্ঠ থেকেও কেবলমাত্র এক একাদশীর দিন

কলাগাছের একটি 'আউট' পাতা দেখে পরদিন সে পাতায় ভাত পাবেন ভেবেছিলেন বলে মৃত্যুর পর যমদূতের সাথে যমপুরীতে যেতে হয়েছিল এবং শাস্তিস্বরূপ মাথায় ডাসের প্রহারে জর্জরিত হয়েছিল। এই ঘটনাকে নেই আকুড়ে দাদা মুক্তিজালে যে ভাবে চতুরতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন তাতে বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনের এই কঠোর সমাজবিধি ও পাপপুণ্যের খতিয়ানের প্রতি লেখকের বাই প্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার

এভাবে দেখা যায় কথা সাহিত্যে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে তৎকালীন সমাজ সমস্যা ও নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন আন্দোলনকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসগুলি ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথের মতো ঔপন্যাসিকদের লেখনীতেও হাজির হয়েছে বিংবা সমস্যা, সপত্নী সমস্যা, কৌলীন্য, কন্যাপণ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি। তবে এই সমস্যাগুলিকে সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসগুলিতে এবং উদার সংস্কারপন্থী পুরুষের সহায়তায় তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। সেখানে নারী সমাজে তার যথাযোগ্য স্থান খুঁজে পেয়েছে যোগ্য জীবনসঙ্গীর সহায়তায়। আবার কোন কোন উদ্দেশ্য প্রধান উপন্যাসে লেখক সমস্যাটিকে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, সমাধানের পথ নির্দেশ করেন নি। সংস্কারের সপক্ষে রচিত উপন্যাসগুলিতে বিধবা বা কুলীন নারীর জীবন সমস্যার যে সমাধান দেখানো হয়েছে আন্দোলন নিরপেক্ষ উপন্যাসগুলিতে কিন্তু নারীর পরিণতি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। সেখানে চিরাচরিত প্রথা বা দেশাচারের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে নারীকে, পুরুষ ঔপন্যাসিকের লেখনীতে নারী প্রতিবাদী হয় নি, হয়েছে সর্ব্বংসহা, কোমলা, পতিপ্রাণা। এই প্রচলিত 'টাইপ' নারীকেই শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঔপন্যাসিকেরা এবং তারই জয়গান গেয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী

- রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্কিমচন্দ্র, চরিত কথা, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। কলিকাতা, ১৩২০, পৃঃ-৩১-৩২ দ্রঃ।
- পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈশব সহচরী - (১৩৩৮) ঃ - ২১২-২১৩ দ্রঃ।

- শিবনাথ শাস্ত্রী, মেজারাঁ, প্রথম সংস্করণ ১৮৭৯-র ভূমিকা দ্রঃ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, মেজ বৌ, নবম সংস্করণ, ১৯০৩, পৃঃ-৩-৪ দ্রঃ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, যুগান্তর, শিবনাথ উপন্যাস সমগ্র, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪, পৃঃ-১০৯ দ্রঃ।
- তদের, পৃঃ ১৮ দঃ।
- প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক, প্রথম বন্ড (১৩৫৭) পৃঃ ৪ ৪ ।
- রমেশ চন্দ্র দত্ত, সংসার কথা, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭০, পৃঃ ৩৫৮ প্র